ইবনে মাসুম

মুক্তির পয়গাম

ইবনে মাসুম

আইসিএস পাবলিকেশন
ঢাকা

মুক্তির পয়গাম

কি সুন্দর এই পৃথিবী! চোখ জুড়ানো বিস্তীর্ণ শ্যামল শস্য ক্ষেত। গাছের ডালে ডালে রঙ-বেরঙের ফল ফুল, তারই মাঝে রঙ-বেরঙের পাখ-পাখালি প্রজাপতির মনভোলানো খেলা। মন জুড়িয়ে যায়। মন জুড়িয়ে যায় বিরাট আকাশটার দিকে তাকিয়ে থেকে। মেঘের কোলে ভেসে বেড়াচ্ছে স্বাধীন ডানা মেলা পাখিরা, রোদ হাসছে ঝিকমিক। কি সুন্দর! কি সুন্দর এই সৃষ্টি! কি বিরাট বিস্ময়কর এই সৃষ্টি! সৃষ্টির এই সৌন্দর্য উপভোগ করে শেষ করা যায় না। এর সীমা-সংখ্যা গুণে শেষ করা যায় না। বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণু মেনে চলছে আল্লাহর আইন। এই শৃংখলার কোন ব্যতিক্রম নেই। আর এ জন্যেই এই বিশ্বজগত এতো সুন্দর। বিরাট এ বিশ্বজগতে বিরাজ করছে অনাবিল শান্তি, ঐক্য আর শৃংখলা।

মানুষ এই দুনিয়ার সুন্দরতম সৃষ্টি। আশরাফুল মাখলুকাত বলা হয় তাকে। অন্যান্য সৃষ্টি থেকে আলাদা তার মর্যাদা। বিশেষ তার স্থান। মানুষ এই দুনিয়ায় আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি, আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন জ্ঞান-বিবেক, দিয়েছেন ভাল-মন্দ বুঝবার ক্ষমতা। সে যেমন এই জ্ঞানের আলোকে ভাল কাজ করতে পারে তেমনি খারাপ কাজ করার রয়েছে তার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা। কিন্তু কেন আল্লাহ মানুষকে এই বিশেষ মর্যাদা দিলেন? কেন দিলেন এমন স্বাধীনতা? এর পিছনে রয়েছে আল্লাহর এক মহান উদ্দেশ্য। তা হলো, বিশ্বে প্রকৃতির অন্যান্য সৃষ্টি যেমন আল্লাহর নিয়ম মেনে তৈরি করছে অনাবিল শান্তির জগত তেমনি মানুষ তার স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও যেনো আল্লাহর পথকে বেছে নিতে পারে। খারাপ কাজ করার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও যাতে নিজের ইচ্ছায় আল্লাহর আইনের গোলামীকে বরণ করে নিতে পারে। আর তারই ফলে তাদের জীবনে নেমে আসবে শান্তি। পৃথিবীতে গড়ে উঠবে এক সুন্দর শান্তিপূর্ণ সমাজ।

অশান্তির কারণ

কিন্তু এই দুনিয়ার দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই মানুষে মানুষে আজ সৃষ্টি হয়েছে ভেদাভেদ, হানাহানি, হিংসা-বিদ্বেষ। অমানুষের সমাজে সে ঐক্য কোথায়? কোথায় সে শান্তি? এর কারণ কি? আগেই বলা হয়েছে, ভাল ও মন্দ কাজ করার ইচ্ছাটা পুরোপুরি মানুষের। আল্লাহ্ মানুষের উপর জোর করে তার বিধান চাপিয়ে দিতে চান না। বরং আল্লাহ্ দেখতে চান মানুষ তার নিজের ইচ্ছায় তাঁর বিধান বা এই শান্তির পথকে বেছে নেয় কিনা। যখন মানুষ এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করে আল্লাহর পথ থেকে সরে গেছে, তখনই নেমে এসেছে মানুষের জীবনে বিপর্যয় ও অশান্তি।

মুক্তির পথ

তাহলে কি মানুষকে এই অশান্তি সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন? বিভেদ ও বিশৃংখলার জন্যে সৃষ্টি করেছেন? কঠিন ও জটিল এই পৃথিবীতে মানুষকে পথের সন্ধান না দিয়েই ছেড়ে দিয়েছেন? না, কখনই তা হতে পারে না। আল্লাহ তো দয়াময় ও মেহেরবান। যে আল্লাহ্ বিশাল এই পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্যে, যে আল্লাহ্ সব মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছেন আলো, বাতাস আর খাবার দিয়ে সেই আল্লাহই মানুষকে বাতলে দিয়েছেন সরল, শান্তির পথ— সিরাতুল মুস্তাকিম। কোন্ পথে চললে মানুষ পাবে শান্তি, কোন্ পথে আসবে মানুষের মর্যাদা, কোন্ পথে চললে মানুষ তার দায়িত্ব পালন করতে পারবে তা তিনি সৃষ্টির সাথে সাথেই জানিয়ে দিয়েছেন মানুষকে। শিখিয়ে দিয়েছেন প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ)কে। হযরত আদম (আ) তাঁর গোটা জীবন সেইভাবে চালিয়েছেন। তাঁর পুত্র পরিজনকেও সেইভাবে পরিচালনা করেছেন। তারপর দিন দিন মানুষের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। ছড়িয়ে পড়লো মানুষ পৃথিবীর আনাচে-কানাচে আস্তে আস্তে আল্লাহর পথও ভুলে

গেল তারা। রাহমানুর রাহীম আল্লাহ আবার মানুষকে মুক্তির পথ বাতলিয়ে দিতে চাইলেন। তিনি মানুষের মধ্য থেকে বিশেষ কিছু মানুষকে মনোনীত করলেন। এই মনোনীত বান্দারা হলেন নবী ও রাসূল। এবং সেই বাতলিয়ে দেয়া পথের নাম— 'ইসলাম'। আল্লাহর এই মনোনীত বান্দারা তাঁর হুকুম নিজেরা মেনে চলেছেন আর তাদের যুগের সাধারণ মানুষদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন— দেখো, এইভাবে চলো, এইভাবে নিজেদের জীবনকে গড়ে তোল, সমাজকে গড়ে তোল। শুধু মুখে মুখে নয়, কাজের মাধ্যমে তাঁরা বুঝিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর পথ কোনটি। তাই 'ইসলাম' শুধু মাত্র একটি ধর্মের নাম নয়। ইসলাম আল্লাহর মনোনীত শান্তির পথ। এই দুনিয়ায় মানুষের জীবন-যাপনের পথ নির্দেশ।

সর্বশেষ নবী হলেন আমাদের প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সা)। তিনি সকল নবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবী। আল্লাহ তাঁর কাছে যে বাণী পাঠিয়েছেন তা হলো-'আল কুরআন'। কুরআন আজও হুবহু আমাদের মাঝে আছে অথচ অন্যান্য নবীদের শিক্ষা আজ আর অক্ষত অবস্থায় নেই। তাই আল্লাহর দেখানো পথ আমরা এখন একমাত্র হযরত মুহাম্মাদ (সা)এর কাছ থেকে পেতে পারি। ইসলাম বলতে আমরা এখন যা বুঝি তা হলো-হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর কাছ থেকে দেয়া শিক্ষা-দীক্ষা।

মানুষের গড়া মতবাদ

আল্লাহর দেখানো এই মুক্তির পথকে বাদ দিয়ে মানুষ নিজে তার চলার পথ রচনার চেষ্টা করেছে বহুবার। কেউ বলেছে 'এ পৃথিবীর কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। এ দুনিয়াটাই সব-দুনিয়ার সুখ শান্তিই সব। অতএব 'খাও দাও ফুর্তি কর।' আর এ জন্যে অন্যকে ঠকিয়ে বড়লোক হওয়া অন্যায় নয়। শ্রমিককে খাটিয়ে তোমার টাকাকে আরো বাড়াও। কিন্তু তাদেরকে ঠকানো কোন ক্ষতি নেই। কে তোমাকে আটকাবে? পরকাল? তা তো নেই।' এই ধরনের চিন্তা বা মতবাদের নাম হলো পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদ সমাজে এক দলের ঘাম

আর রক্তের বদলে বড়লোক হলো অন্য একদল। বড়লোকেরা আরও বড়লোক হলো গরীবরা হলো আরও গরীব। সমাজের সমস্ত কর্তৃত্ব চলে গেল এইসব লোকের হাতে। পুঁজিবাদ তাই কোন শান্তির দিশা দেখাতে পারলো না মানুষকে।

এই অন্যায় ও বেইনসাফীর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ ক্ষেপে উঠলো। ক্ষেপে উঠলো শ্রমিকরা, ক্ষেপলো সাধারণ কৃষকরা। ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো আরও একটা মতবাদ। তার নাম কম্যুনিজম। এই মতবাদের হোতারা বললো— 'দেখো, মানুষ ধনের জন্য অন্যের উপর জুলুম করে। অতএব সকলের নিজস্ব সব সম্পদ কেড়ে নাও। সকলের সম্পদ কেড়ে নিয়ে গড়ে তোলো গরীবদের সমাজ। সব সম্পদের মালিক হবে রাষ্ট্র। সকলেই খাটবে। সকলে সমাজ মজুরী পাবে। সকলেই হবে সমান।' কথাগুলো সত্যি খুব সুন্দর। গরীবরা যারা এতোদিন ছিল নির্যাতিত তারা আশার আলো দেখলো তাতে। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা ঘটলো অন্য রকম। গরীবরা শাসক হবে কিভাবে? সব গরীবতো একসাথে দেশ শাসন করতে পারে না। তাই স্বভাবতই গুটিকতক লোকের হাতে চলে গেল দেশ শাসনের সর্বময় ক্ষমতা। আর সেই সাথে তারা হলো সারাদেশের সম্পদের হর্তাকর্তা। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে সম্পদের মালিক ছিল গুটিকতক লোক। তাদের হাতে তেমন ক্ষমতা ছিল না। এখন এই নতুন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্যে নতুন পথের সন্ধান করলো। তারা বুঝলো দেশ এখন সবার। সরকার সকলের। অতএব বিরোধিতা করা যাবে না। সমালোচনা করা যাবে না। যারা বিরোধিতা করবে, সমালোচনা করবে তারা সরকারের শত্রু অতএব জনগণের শত্রু। আর তাই লাগাম আঁটা হলো সকলের মুখে। কেড়ে নেয়া হলো মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা। হায় নিয়তি! মানুষকে শুধু একমুঠো খাবারের জন্যে হারাতে হলো সবকিছু। এই নতুন মতবাদও মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে পারলো না। সময়ের ব্যবধানে এই মতবাদও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো।

এইভাবে দুনিয়ার সব দেশের সব সময়ের মানুষ চেষ্টা করেছে তাদের নিজেদের বুদ্ধি ও ক্ষমতা খাটিয়ে চলার পথ রচনা করতে। কিন্তু বার বার ব্যর্থ হয়েছে। এর প্রকৃত কারণ কি? এর একটি মাত্র কারণ— মানুষ এই মহাসত্যকে বুঝতে পারেনি, যে মানুষের পক্ষে মানুষের জন্যে জীবন পথ রচনা করা সম্ভব নয়। মানুষের সীমিত জ্ঞান, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দ্বারা এমন কোন পথ রচনা করা সম্ভব নয় যা সব যুগের, সব দেশের, সকল মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের পথ দেখাতে পারে। কারণ তার আগের লোকদের সে দেখেনি, পরের লোকদের দেখবে না। দুনিয়ার সবগুলো দেশ আর সমাজ সম্পর্কে তার পুরোপুরি ধারণা থাকা সম্ভব নয়, তাহলে তার পক্ষে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ রচনা করা কি করে সম্ভব হতে পারে? মানুষের কল্যাণের পথতো একমাত্র আল্লাহই দিতে পারেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে তার রহমত দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। যার কাছে মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা, ভুল-ত্রুটি সবকিছু পরিষ্কার এবং যিনি দুনিয়ার সব সমাজের সকল মানুষকে সম্পূর্ণরূপে জানেন।

পৃথিবীর মানুষ মানুষের গড়া সব মতবাদকে পরীক্ষা করে দেখেছে। সাম্যের নামে মানুষ খেয়েছে ধোঁকা। যারা বিশ্ব মানবতার বুলি আওড়াতো তাদের কাছে আজ শুধু নিজের জাতির উপকার করাই আদর্শে পরিণত হয়েছে। তথাকথিত গণতন্ত্র এনেছে নৈতিক-উচ্ছৃখলা, সৃষ্টি করেছে পুঁজিবাদী সমাজ, আধুনিক সভ্যতার চরম শিখরে ওঠে মানুষ ভুলতে পারেনি সাদাকালোর ভেদাভেদ। ইহুদীবাদ আজ চরমভাবে হুমকি দিচ্ছে মানবতাকে। নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার মোহে গড়ে তোলা হয়েছে মরণাস্ত্রের পাহাড়। বৃহৎ শক্তিগুলোর হুমকির দাপটে-যুদ্ধের ভয়ে মানবতা আজ সদা কম্পমান। একদিকে উপচে পড়ছে ভোগের পেয়ালা, অন্যদিকে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ না খেয়ে গুণছে মৃত্যুর প্রহর।

সারা বিশ্বের অগণিত মানুষের আজ একটি মাত্র জিজ্ঞাসা। এই নিরাশা, এই হিংসা-বিদ্বেষ এই লাঞ্ছনার কি শেষ নেই? মুক্তির আশায়, শান্তির আশায় মানুষ এক পথ ছেড়ে চলতে চেয়েছে অন্যপথে। কিন্তু বার বার হয়েছে ব্যর্থ। পুরাতন শিকলের বদলে নতুন আর এক শিকল মানুষের গলায় জড়িয় পড়েছে। তাই মানুষের সামনে আজ একটি মাত্র পথ। তার স্রস্টার দেয়া সহজ সরল পথ 'ইসলাম'।

আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্যে মুক্তির পথ হলো হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর প্রদর্শিত পথ— 'ইসলাম'। একথা শুধু মুসলমানরা নয়, অমুসলিম গবেষকরাও স্বীকার করেছেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা) মানুষের জন্যে যে শিক্ষা রেখে গেছেন তা আজও অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। তাঁর ওফাতের চৌদ্দশত বছর পরও তাঁর শিক্ষা অটুট রয়েছে কুরআন এবং হাদীসের মধ্যে। আজকাল তো মানুষের উন্নতিও হয়েছে অনেক। পৃথিবী এখন মানুষের কাছে ছোট। খুব সহজেই রাসূলের (সা) এই শিক্ষাকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছানো সম্ভব। তাই একথা খুব স্বাভাবিকভাবে দাবী করা যায় যে মানুষের জন্যে সর্বশেষ এবং একমাত্র মুক্তির পথ এখন ইসলাম। একবিংশ শতাব্দীর নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষ মুক্তি পেতে পারে একমাত্র ইসলামের পথেই।

ইসলাম সাধারণ অর্থে একটি ধর্মের নাম নয়। ইসলামের প্রকৃত অর্থ তাই আমাদেরকে ভালভাবে বুঝতে হবে। আমাদেরকে বুঝতে হবে, আমরা যারা মুখে মুখে ইসলাম মেনে নিয়েছি কিংবা মুসলমান বলে নিজেদেরকে পরিচয় দেই— তাদের প্রকৃত দায়িত্ব কি?

মুসলমান কাকে বলে

মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করলেই মুসলমান হওয়া যায় না। মুসলমানের মত নাম রাখলেই তাকে মুসলমান বলা যায় না। ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হতে হয়। ইসলাম গ্রহণ করলেই কেবল মুসলমান হওয়া

যায়। আর এই ইসলাম গ্রহণ অর্থ 'আমি মুসলমান হয়েছি' কিংবা 'আমি মুসলমান' এই কথা বলা নয়।

ইসলাম গ্রহণ করার অর্থ

(ক) হযরত মুহাম্মাদ (সা)এর শিক্ষা-দীক্ষাকে অন্তরের সাথে সত্য বলে গ্রহণ করা;

(খ) নিজের জীবনে এই শিক্ষাকেই একমাত্র পথ হিসেবে মেনে নেয়া, এবং

(গ) এই ব্যবস্থা অনুযায়ী গোটা জীবনকে গড়ে তোলা।

আল্লাহ তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের মাধ্যমে আমাদেরকে যে সমস্ত জিনিস বিশ্বাস করতে বলেছেন তা বিশ্বাস করার অর্থ হলো— 'ঈমান'।

আর এই বিশ্বাসের আলোকে দুনিয়ার প্রতিটি কাজ করার নাম— 'ইবাদত' বা দাসত্ব করা।

ঈমান

মুসলমান হতে হলে কতকগুলো জিনিসের উপর বিশ্বাস আনতে হয়। ইসলামী পরিভাষায় একে বলা হয় ঈমান বা আকীদা। যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান ঠিক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের কোন প্রশ্নই আসে না। সাধারণভাবে ঈমানকে বলা যেতে পারে কতকগুলো বিষয় সম্পর্কে সুস্পস্ট জ্ঞান বা ইলম। আমরা সবাই জানি যে কোন কাজ করতে হলে সেই কাজ সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকতে হয়। এই ধারণাটুকু না থাকলে সে কাজও ভালভাবে করা যায় না। তেমনি ইসলামকে গ্রহণ করে মুসলমান হতে হলে জানতে হবে ইসলামী ধ্যান-ধারণার ভিত্তি কি। আর এজন্যে জ্ঞান বা ইসলামকে ইসলামে এতো গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

যে সমস্ত বিষয়ের উপর বিশ্বাসকে ইসলামের মূল ভিত্তি বলা হয়, তা হলো ঃ

⁘ আল্লাহর উপর বিশ্বাস,

⁘ রাসূলের উপর বিশ্বাস,

⁘ আখেরাত বা পরকালের উপর বিশ্বাস,

⁘ ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস,

⁘ আল্লাহর কিতাবের উপর বিশ্বাস।

তাওহীদ

আমাদের চারপাশে বিরাট জগত-আকাশ, পৃথিবী, গাছপালা, কীট-পতঙ্গ পশু-পাখি, মানুষ-এসব কি আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়েছে? এসব কিছু যে একটা সুন্দর নিয়ম মেনে চলছে, তা কি কোন পরিচালক ছাড়াই হচ্ছে? না, তা কখনো হতে পারে না। কেননা আমরা সবাই এটা জানি যে সামান্য একটা বলও কেউ ধাক্কা না দিলে নড়তে পারে না। ছোট্ট একটা খেলনা একজন কারিগর ছাড়া আপন-আপনি তৈরি হতে পারে না। তাই এই বিশ্ব জগতের একজন কারিগর আছেন-মালিক আছেন-পরিচালক আছেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর দয়ায় আমরা বেঁচে আছি। তিনি আমাদের রিজিক দেন। যা কিছু হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে— সবই তাঁর জানা আছে। কিন্তু এ কথাটি মুখে স্বীকার করলেই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা সম্পূর্ণ হয় না। প্রয়োজন, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে প্রভু বা মালিক হিসেবে মেনে নেয়া। চাকর বা গোলাম যেমনভাবে তার প্রভুকে মেনে চলে, তার হুকুম অনুযায়ী চলে। প্রভুর অনুপস্থিতিতেও নিজের খেয়ালখুশী মত চলে না। মালিকের নিয়ম মত সব কাজ করে। তেমনি ভাবে আল্লাহকে প্রভু হিসেবে মেনে নিয়ে জীবনের প্রতিটি কাজ তাঁর আইন অনুযায়ী করতে হবে। এটা

অন্তর থেকে বিশ্বাস করতে হবে যে, আমাদের জীবনে একমাত্র তাঁরই আইন চলবে। এই দুনিয়ায় একমাত্র তাঁরই হুকুম চলতে পারে। মানুষের বানানো আইনের সামনে মাথা নত করা যাবে না। কিন্তু আমরা কি দেখি? আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেও আমরা জীবনের এক এক সমস্যার জন্যে এক একটা শক্তির দ্বারস্থ হচ্ছি। এইভাবে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে অংশীদার বানানোকে 'শিরক' বলা হয়। শিরক মহাপাপ-সবচেয়ে বড় গোনাহ। তাই আমাদেরকে জেনে নিতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে এই দুনিয়ায় কিভাবে জীবন-যাপন করতে বলেছেন। এসব কিছু জেনে নিয়ে পুরোপুরিভাবে মেনে চলতে পারলেই তাঁকে প্রভু হিসেবে মেনে নেয়া সার্থক হবে। আল্লাহ্‌র প্রকৃত গোলাম আমরা তখনই হতে পারব যখন জীবন চলার পথ হিসেবে একমাত্র তাঁর দেয়া পথ 'সিরাতুল মুস্তাকিমকে' আমরা বেছে নেবো। কোন কাজ করলে একমাত্র তাঁর জন্যেই করবো। কাউকে ভাল বাসলে একমাত্র তাঁর জন্যেই ভাল বাসবো। কাউকে ত্যাগ করলে একমাত্র তাঁর জন্যেই ত্যাগ করবো। তবেই তো হবে আল্লাহ্‌র প্রতি সত্যিকারের ঈমান আনা।

রিসালাত

এমনিভাবে ঈমান আনতে হয় নবী-রাসূলের প্রতি। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবনটা সহজ নয়। জীবনে হাজারো সমস্যার সামনে তাকে পড়তে হয়। আর তখনই প্রশ্ন আসে কোন্‌টা ঠিক কোনটা ভুল। কোন্ কাজ করতে হবে আর কোন্‌টা থেকে দূরে থাকতে হবে। দুনিয়ার এসব ব্যাপার সকলে সমান বুঝে না। তাই এমন একজনের নিকট থেকে তা জেনে নিতে হবে যিনি সব কিছু ভালভাবে জানেন। মানুষের জীবনের সব সমস্যার সমাধান একমাত্র আল্লাহ দিতে পারেন। তাই তিনি মানুষের মাঝে যাদেরকে দুনিয়া জাহানের এসব রহস্য জানিয়ে দিয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে আমাদেরকে তা জেনে নিতে হবে। জীবনের পথে তারাই আমাদের নেতা। আর এই নেতারাই হলেন নবী-রাসূল। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সমাজে আল্লাহ তাঁর নবী-রাসূলদেরকে পাঠিয়েছেন তাঁর বাণী দিয়ে। শেষ বারের মত যিনি

আল্লাহর কাছ থেকে শান্তির পথ-নির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন তিনি নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)। আমরা তাঁর উম্মত বা অনুসারী। কিন্তু এতটুকু বিশ্বাস করার মধ্যে কোন কল্যাণ নিহিত নেই। রাসূলের (সা) প্রতি বিশ্বাস আনার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে নিজের জীবনকে পথের দিশারী বা নেতা হিসেবে তাঁকে মেনে নেয়া। রাসূলের শিক্ষা-দীক্ষার উপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস এনে তাঁর দেখানো পথে দৃঢ় পদে এগিয়ে যাওয়া। হযরত মুহাম্মাদ (সা)কে শেষ এবং শ্রেষ্ঠ রাসূল্ হিসেবে মেনে নেয়ার অর্থই হলো একথা মেনে নেয়া যে, কিয়ামত পর্যন্ত তিনিই আমাদের নেতা। তিনি আমাদের মুক্তির দিশারী। মানবতার মুক্তি একমাত্র তাঁর দেখানো পথেই আসতে পারে।

আখিরাত

আল্লাহ ও রাসূলের (সা) উপর ঈমান আনার পর আমাদেরকে আর একটি বিষয়ের প্রতিও ঈমান আনতে হয়। তা হলো এই যে, দুনিয়ার এই জীবনই শেষ নয়। মানুষ এই দুনিয়ায় ভাল বা মন্দ কাজ করলে তার ফল দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং জীবনের প্রতিটি কাজের জন্যে মৃত্যুর পর পরকালেও তাকে জবাবদিহি করতে হবে। এবং তখনই তাকে চূড়ান্ত ফলাফল দেয়া হবে। ভাল কাজের জন্যে পাবে বেহেশত আর খারাপ কাজের জন্যে পাবে দোজখ। এই সবের উপর বিশ্বাস আনার অর্থ হলো আখেরাতের প্রতি ঈমান। এই ঈমানও সত্যিকারভাবে সম্পূর্ণ হবে তখন যখন জীবনের সব কিছুতে সব সময়ে পরকালের প্রতি ঈমানকে কাজে লাগানো হবে। আখিরাতের প্রতি ঈমান না থাকলে, আল্লাহর কাছে জবাব দেবার ভয় না থাকলে, মানুষ কখনো ভাল মানুষ হতে পারে না। যে কাজই সে করবে নিজের খেয়াল খুশীমত করবে। খারাপ কাজ করতে, মানুষ ঠকাতে, মানুষের উপর জুলুম করতে, দেশের ক্ষতি করতে সে কোন পরোয়াই করবে না। ধীরে ধীরে সব মানুষ শঠ, অসৎ-চরিত্র ও খারাপ প্রকৃতির হয়ে গড়ে উঠবে। দুনিয়ায় নেমে আসবে সীমাহীন অশান্তি। যখন মানুষ ঈমান আনে আখিরাতের প্রতি, তখন আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে

এই ভয় নিয়ে সে কাজ করে। তখন তার দ্বারা কোন খারাপ কাজ হতে পারে না। সে হয়ে উঠে এক সুন্দর আর আদর্শ মানুষ।

কিতাব ও ফিরিশতা

আল্লাহ নবীদের কাছে যে বাণী পাঠিয়েছেন তাকে 'অহী' বলা হয়। অহীর মাধ্যমে আল্লাহ অনেক নবীর কাছে কিতাব পাঠিয়েছেন। যেমন হযরত মূসা (আ)এর কাছে এসেছে 'তাওরাত', হযরত দাউদ (আ)এর কাছে 'জাবুর' আর হযরত ঈসা (আ)এর কাছে 'ইঞ্জিল'। এমনিভাবে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)এর কাছে যে কিতাব এসেছে তার নাম— 'আল কুরআন'। কুরআনে রয়েছে মানুষের জন্যে আল্লাহর হুকুম-আহকাম। আমাদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্যে-দুনিয়ায় এক সুখী-সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার জন্যে-মৌলিক নিয়ম নীতি এসেছে এই কুরআনে। আর আল্লাহর নবী কুরআনের আলোকেই নিজের জীবনকে গড়ে তুলেছিলেন। এই কুরআনের দেখানো পথে কায়েম করেছিলেন এক সুন্দর ইসলামী সমাজ। সেই কুরআনকে কি আমরা তেমনিভাবে আমাদের জীবনে গ্রহণ করেছি? আমরা কি কুরআনের পথে নিজেদেরকে এবং সমাজকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি? না, বরং 'অতি ভক্তির' সাথে কুরআনকে তাকের উপর তুলে রেখেছি। কুরআনে আমাদের রব আমাদের জন্যে কি কি নির্দেশ দিলেন তা জানার এবং তো মেনে চলার আগ্রহ আমাদের মধ্যে নেই। শুধু কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে সওয়াব দেখেছি। একদিকে কুরআন তিলাওয়াত করছি অন্যদিকে কুরআনের বিধি বিধানের উল্টো কাজ করছি। প্রতি মুসলিম ঘরে আজ সুন্দর কাপড়ে মুড়ানো, সুন্দরভাবে সাজানো আছে কুরআন। কিন্তু আমাদের চারপাশের সমাজে বিরাজ করছে ঠিক কুরআনের উল্টো আইন-কানুন। এই অবস্থায় কিভাবে আমরা দাবী করতে পারি যে, কুরআনের উপর রয়েছে আমাদের অবিচল বিশ্বাস? কুরআনের প্রতি আমাদের ঈমানের দাবী তখনই পূর্ণ হতে পারে যখন কুরআনকে জীবনপথের চলার দিশা হিসেবে মেনে নেবো। যখন কুরআনকে আমাদের

নিজেদের এবং সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় আমরা তৎপর হবো। তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ও কিতাবের উপর ঈমান আনার সাথে সাথে তকদির ও ফিরিশতাদের প্রতিও আমাদের ঈমান আনা দরকার। ফিরিশতারা নূরের তৈরি। আল্লাহর হুকুমেই তারা প্রত্যেকেই এক একটি দায়িত্ব পালন করেন।

ইবাদত

ঈমানের আসল কথা হলো কোন প্রকার সন্দেহ ছাড়াই তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত এবং কিতাব ইত্যাদির উপর বিশ্বাস আনা। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবন গড়ে তোলার নাম ইবাদত অর্থাৎ দাসত্ব বা গোলামী করা। মানুষ ও জ্বীন জাতিকে সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হলো তারা আল্লাহর ইবাদত করবে। তাই কোনো অবস্থাতেই মানুষ এই দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে না। যেহেতু আল্লাহর গোলাম বা দাস হিসাবেই আমাদের জন্ম তাই আমাদের নিজেদের গোটা জীবনটাই তাঁর গোলামী বা দাসত্ব করে কাটিয়ে দেয়া উচিত। এর মানে এ নয় যে দুনিয়ার সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে কোথাও বসে 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ' করতে হবে। বরং ইবাদত করার আসল অর্থ হলো আমরা দুনিয়ায় যে সব কাজ করবো তা আল্লাহর আইন ও নিয়ম অনুযায়ী করবো। মানুষের জীবনের ঘুম, বিশ্রাম, পানাহার, চলাফেরা, অন্যের সাথে ব্যবহার, টাকা পয়সার লেন-দেন মোটকথা প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী করার নামই ইবাদত। এইভাবে মানুষের জীবন গড়ে তোলার জন্যে প্রাথমিকভাবে কতকগুলো কাজ করতে হয়। যেমন আল্লাহ্ ও রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন, নামাজ পড়া, রোজা রাখা, জাকাত দেয়া এবং সামর্থ্য থাকলে হজ্ব করা। এগুলো হচ্ছে মুসলমানদের আনুষ্ঠানিক কাজ। এসব কাজ মুসলমানদের উপর ফরজ বা অবশ্যকরণীয় করা হয়েছে যেনো এ সবের মাধ্যমেই তাদের পুরো জীবন আল্লাহর দাসত্বে পরিণত হতে পারে। তাই একজন লোক সারাদিন নামাজ পড়ার পরে রোজার মাসে সারা মাস উপবাস থাকার পরে আর পয়সা খরচ করে হজ্ব করার পরেও যদি তার

হৃদয় মনে খোদার ভয়, প্রেম ও ভালবাসা সঠিকভাবে সৃষ্টি না হয় তবে তার নামাজ, রোজা ও হজ্ব পালনের উদ্দেশ্য একেবারে ব্যর্থ হয়েছে বলতে হবে। লোক দেখানো নামাজ, রোজা, হজ্ব ও জাকাতের কোন মূল্য নেই।

জিহাদ

নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত তাই অন্যান্য ধর্মের পূজা-উপাসনা ও যাত্রার মত কোন অনুষ্ঠানমাত্র নয়। এই কাজ করলেই আল্লাহ তায়ালা কারো উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান না। ইবাদতের আসল উদ্দেশ্য হলো মানুষের উপর থেকে আল্লাহ ছাড়া অন্য শক্তির প্রভুত্বকে খতম করা। আর এই উদ্দেশ্যে জান মাল ব্যয় করে সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করার নাম জিহাদ। তাই জিহাদ ইসলামের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। মানুষের জীবনে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম ও প্রচেষ্টাকে বলা হয় জিহাদ। জিহাদ কথাটার অর্থ তাই ব্যাপক। আমাদের চারিদিকে সীমাহীন অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম নির্যাতন, পাপ, কুশিক্ষা, নোংরামি ও উলঙ্গপনার মূল কারণ কি কখনো ভেবে দেখেছি? এ সবের প্রকৃত ও মূল কারণ হলো আজকের সমাজের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও শক্তি সামর্থ্য রয়েছে অত্যাচারী দুরাচারী লোকদের হাতে। সাধারণভাবে আমরা দেখি একজন ড্রাইভারই নিজের ইচ্ছামত গাড়িকে যেদিক ইচ্ছা সেদিকে নিতে পারে। তাই সমাজের উপর নেমে আসে অশান্তি বিপর্যয়। আর তা থেকে মুক্তির একমাত্র পথই হলো এই অসৎ নেতৃত্ব থেকে সমাজকে মুক্ত করে ফেলা। ইসলাম চায় দুনিয়ার সব জায়গায় এই অসৎ নেতৃত্বকে খমত করে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে আর এই প্রচেষ্টার নামই জিহাদ। এই জন্যে প্রয়োজন হলে শক্তি প্রয়োগ যেমন জিহাদ তেমনি এ উদ্দেশ্যে সাহিত্য রচনার জন্যে কলম ধরাও তেমনি জিহাদ।

কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত। তা হলো জিহাদের প্রথম পদক্ষেপ হলো নিজের সাথে জিহাদ। নিজের মন ও মানসিকতায় আল্লাহ ও রাসূলের শিক্ষা দীক্ষার বিরোধী কোন শিক্ষা ও ইচ্ছা থাকলে

সর্বপ্রথম তার বিরুদ্ধেই জিহাদ করতে হবে। যে ব্যক্তি নিজের ভেতরের বিদ্রোহী আত্মার সাথে জিহাদ করেনি, সমাজের চার পাশের অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে সে জিহাদ করতে পারে না। তাই জিহাদ বলতে যদি কেউ সাধারণত, যুদ্ধ মারামারি, কাটাকাটি বুঝে তবে ভুল হবে। জিহাদ একটি পবিত্র কাজ। মুসলমানদের পবিত্র দায়িত্ব।

মুসলমানদের দায়িত্ব

মুসলমানদের দায়িত্ব তাই নিজেদের জীবনে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার সাথে সাথে দুনিয়ার সবক্ষেত্রে আল্লাহর আইনকে কার্যকরী করা। মুসলিম জীবনের মিশন কি তা সুন্দরভাবে আল্লাহ বলে দিয়েছেন কুরআনের সূরা আল-হজ্বে। মুসলমানদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে - 'হে ঈমানদাররা! রুকু কর, সিজদা কর এবং ইবাদত কর তোমাদের প্রভুর আর সৎ কাজ করতে থাকো তবেই তোমরা লাভভান হবে এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিৎ। তিনিই তোমাদের এই দ্বীন বা পথ পছন্দ করে দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করা হয়নি। এতো তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের পথ, পূর্ব থেকেই তিনি তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন এবং এই কেতাবেও (সেই নাম রাখা হয়েছে) যেন রাসূল তোমাদের প্রতি সাক্ষী হতে পারেন এবং তোমরা মানব জাতির প্রতি সাক্ষী হতে পার। অতএব তোমরা নামাজ কায়েম কর ও জাকাত দিতে থকো। এবং আল্লাহকে (আল্লাহর আইনকে) শক্ত করে ধরো, তিনিই তোমাদের রক্ষাকর্তা, তিনিই অতুলনীয় মুরব্বী এবং অদ্বিতীয় সাহায্যকারী।' (সূরা হজ্ব ঃ ৭৭.৮৮)

আল্লাহ বলেছেন মুসলমানদের কাজ হলো একমাত্র তাঁরই গোলামী করা। এজন্যে তাদের নিজেদেরকে ভালভাবে গড়তে হবে। আল্লাহ যখন ভাল কাজ করতে বলেছেন তখন এটা স্পষ্ট যে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে একজন মুসলমানকে এ কাজ করতে হবে

নিজের জন্য এবং সেই সাথে সমাজে এক বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্য। নিজকে প্রস্তুত করার পর মুসলমানদের আদেশ করা হয়েছে জিহাদ করার। তারা ন্যায় কাজেও আদেশ দিবে এবং সেই সাথে অন্যায় কাজে দেবে বাধা। যাতে করে আল্লাহর আহবান চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং মানুষ যুক্তি ও বিবেক খাটিয়ে ইসলামকে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু দেখা যায় সমাজের কুসংস্কার, খারাপ নেতৃত্ব এ পথে বাধা সৃষ্টি করে, তখন শেষ ব্যবস্থা হিসেবে তরবারিও ধরতে হয়। নবী রাসূলরা এ দায়িত্ব পালন করেছেন। তারা এ দায়িত্ব পালন করে তাঁদের অনুসারীদেরকে এ কাজ বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। এখন এ দায়িত্ব তাদের অনুসারীদের। এই দায়িত্ব যারা পালন করবে দুনিয়ায় তারা পাবে সম্মান আর আখেরাতে পাবে উত্তম পুরস্কার। কিন্তু এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় জায়গায় তারা হবে লাঞ্ছিত। মুসলমানদের আগে এ দায়িত্ব ছিল বনি ইসরাঈলদের উপর। তারা ছিল হযরত মূসা (আ)এর উম্মত। কিন্তু এ দায়িত্ব অবহেলা করার কারণে তারা হলো দুনিয়াতে লাঞ্ছিত এবং আশ্রয়হীন। তাদের লাঞ্ছনার কথা খোদ কুরআনেই আছে। তারপর এ দায়িত্ব এসে পড়ে মুসলমানদের উপর। রাসূলে খোদা (সা)এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এই জাতি এ দায়িত্বকে তাদের নিজেদের জীবন মৃত্যুর উদ্দেশ্য বানিয়ে নিলো। গড়ে উঠলো মুসলিম নামে এক নিঃস্বার্থ সৈনিক জাতি যাদের হাতে মানবতা পেলো মুক্তির স্বাদ, পেল সত্যের সন্ধান। রাতের অন্ধকারে তাদের মাথা নত হয় পড়তো মহান আল্লাহর দরবারে। দিনের বেলায় তাদের ঘোড়ার খুরের দাপটে কেঁপে উঠতো দুনিয়ার জাহেলিয়াত, অন্যায় ও অসত্য। প্রথম জামানার মুসলমানরা তাদের এ দায়িত্ব সম্পর্কে ছিলেন পূর্ণ সজাগ। তারা এইভাবে কাজ করেছেন এবং ঈমানের পরীক্ষায় ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করেছেন। আর তাই মানবতার ইতিহাসে তাদের নাম উজ্জ্বল ও ভাস্বর হয়ে আছে।

মুসলমানদের বিপর্যয়

কিন্তু আস্তে আস্তে মুসলমানদের মধ্যে এ দায়িত্ব পালনে দেখা দিলো শিথিলতা। আরাম-আয়েশের মধ্যে ডুবে গেলো তারা। অন্যদিকে ইসলামের দিকে ডাকা তো দূরের কথা নিজেদের জীবন থেকে বিদায় নিলো ইসলামী রীতিনীতি। শুধু কথায় ইসলাম মেনে চলা হতো, কাজে নয়। এ সময় পাশ্চাত্যে বিশেষ করে ইউরোপীয় দেশগুলো আধুনিক, জ্ঞান বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে এগিয়ে গেলো অনেক। ব্যবসায়ের সওদা নিয়ে তারা ছড়িয়ে পড়লো পৃথিবীর আনাচে কানাচে। যখনই মুসলিম শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লো তখনই তারা যে আঘাত হেনেছিলো সে আঘাত সহ্য করতে পারলো না মুসলিম শাসকরা। বুদ্ধি ও শক্তির কাছে হেরে গেলো মুসলিম শাসকরা। মুসলিম জাহানে নেমে এলো পরাধীনতার অন্ধকার। মুসলমানরা শুধু শাসন ক্ষমতাই হারালো না, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-অনুষ্ঠান ও আদর্শের উপর আসলো বিজাতীয় আঘাত।

উপমহাদেশে ইসলাম

আমাদের এই উপমহাদেশে ইসলামের ঝাণ্ডা নিয়ে বিজয়ীর বেশে আসলেন যুবক বীর সেনানী মোহাম্মদ বিন কাসেম। কিন্তু তারও আগে ইসলামের সুমহান আদর্শের পরিচয় পেয়েছিল এ দেশের মানুষ। ইসলামের আহবান নিয়ে এসেছিলেন ইসলাম ধর্ম প্রচারক দরবেশগণ। অল্প কিছু দিনের মধ্যে দিল্লীর শাসন ক্ষমতায় বসলো মুসলিম শাসকরা। আর ধীরে ধীরে এদেশে মুসলমানের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। ইতিহাস সাক্ষী এদেশের মুসলিম শাসকরা অন্য ধর্মের লোকদেরকে ক্ষমতার জোরে মুসলমান বানাননি। বরং এ দেশের লোক মুসলমান হয়েছিল ইসলামের সুমহান আদর্শে মুগ্ধ হয়েই। মুসলিম শাসকরা সবাই যে ভাল ছিলেন তা নয়। ধীরে ধীরে তারা আরাম-আয়েশের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। দেশের কল্যাণ,

দশের কল্যাণের কথা ভুলে গেলেন। ফলে শাসন ক্ষমতা দিন দিন দুর্বল হয়ে যেতে লাগলো। মুসলমানদের পূর্বে উপমাহাদেশের শাসন ক্ষমতা ছিল অন্য ধর্মাবলম্বীদের হাতে। তারা ছিল মুসলমানদের ওপর চটা। ইংরেজ বেনীয়রা তাদের সহায়তায় এদেশের শাসন ক্ষমতায় এলো। এবার শুরু হলো এদেশের মুসলমানদের পরাধীন জিন্দেগী। মুসলমানরা অবশ্য পরাধীনতা সহ্য করেননি। ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হলেন মহীশূরের হায়দার আলী ও টিপু সুলতান। ১৮৫৭ সালে জেগে ওঠলো স্বাধীন চেতা মুসলমানরা। ইংরেজদের বিরুদ্ধে শুরু হলো ভারতের সর্বত্র মুসলমানদের এক ব্যাপক সংগ্রাম। এ সংগ্রামে নেতৃত্ব দিলেন দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহের যোগ্য সেনাপতি জেনারেল বখত খান, বাংলার মুসলমানরা যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছে। তাদের হারানো স্বাধীনতাকে ফিরে পাওয়ার জন্য করেছে আপ্রাণ চেষ্টা। এ দেশে ইংরেজদের প্রধান শত্রু ছিল তাই মুসলমানরা। মুসলমানদেরকে তারা সব রকমের অধিকার থেকে বঞ্চিত করলো। আর অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা যারা মুসলমানদের উপরে ছিল হাড়ে চটা তারা এগিয়ে আসলো ইংরেজদের খয়ের খাঁ হয়ে। মুসলমানদের অবস্থা হলো আরো কাহিল। কিন্তু শিকল দিয়ে মানুষ কোন দিন অন্য মানুষকে শতাব্দীর পর শতাব্দী বেঁধে রাখতে পারে না। আর সেই শিকল ভাঙ্গার ইতিহাস সবারই জানা। ১৯৪৭ সালে সৃষ্টি হলো পাকিস্তান। এই দেশের মুসলমানরা চেয়েছিলো একটা ইসলামী সমাজ কায়েম করবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য উপমহাদেশের মুসলমানদের! পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় যারা এলো তারা মুসলমানদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে দিলো না। তারা মুখে মুখে শুধু ইসলামের কথা বললেও ইসলামকে প্রতিষ্ঠার কোন বাস্তব প্রচেষ্টাই চালালো না। ইসলামী আদর্শ ও ন্যায়নীতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার ফলে দেখা দিল চরম বিপর্যয়। দেশের এক অংশের লোকের ওপর চললো জুলুম ও বেইনসাফী। বাঙালী মুসলমানরা যে আশায় পাকিস্তান চেয়েছিল তা তো তারা পেলোই না, বরং তারা হলো বহুমুখী জুলুমের শিকার। তাই বাঙালী মুসলমানরা শুরু করলো স্বাধীনতার সংগ্রাম। ১৯৭১ সালে অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা আর সংগ্রামের ফলে সৃষ্টি

হলো স্বাধীন বাংলাদেশ। বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। সারা বিশ্বের মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে আজ বাংলাদেশের মানুষ জড়িত। আজ সারা দুনিয়ায় প্রায় ১২০ কোটি মুসলমান। অনেকগুলো দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা মুসলমানদের হাতে। তবুও দুনিয়ার দরবারে মুসলিম আজো চরমভাবে লাঞ্ছিত। সারা বিশ্বের নিপীড়িত মানবতার মুক্তি সনদ আল কুরআন যাদের ঘারে, সেই জাতিকে আজ বিশ্বের মানুষের দুয়ারে দুয়ারে হাত পেতে বেড়াতে হচ্ছে। বাংলাদেশের মুসলমান হিসেবে আমাদের উপর যে দায়িত্ব তা আমরা ভুলে যেতে পারি না। আজ সারা বিশ্বের অবহেলিত লাঞ্ছিত মানবতার মুক্তি একমাত্র ইসলামের পথেই। তাই ইসলামের অনুসারী হয়ে আমরা বসে থাকতে পারি না। আজকের দুনিয়া দ্রুত পরিবর্তনের পথে। দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে ধ্বংসের পথে। মুসলিম হিসেবে তাই আমাদের দায়িত্ব পালনের পথে আমাদেরকেও দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসতে হবে। যতই কঠিন হোক না কেন, এটা আমাদের দায়িত্ব। ধ্বংসের পথ থেকে মানবতাকে মুক্ত করার দায়িত্ব এ যুগের মুসলমানদের। সারা বিশ্বের মানুষের দিকে তাকিয়ে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসতে হবে মুসলমানদেরকে। কাজে লাগাতে হবে মুসলিম জাহানে আল্লাহ যে অসীম সম্পদ দিয়েছেন তা সব। এগিয়ে আসতে হবে মুসলিম যুবক, তরুণ, বৃদ্ধ সবাইকে।

একাজের জন্যে প্রথমেই মুসলিম মিল্লাতকে করতে হবে পুনর্গঠিত, ঐক্যবদ্ধ। বহুদিনের জড়তার ঘোর কাটিয়ে এ জাতির মধ্যে আনতে হবে প্রাণ উদ্দীপনা। মানবতার মুক্তি সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে জাতিকে এক সুষ্ঠু পরিকল্পনার আলোকে মুসলিম যুবকদেরকে। যাতে তারা এ দায়িত্ব সহজেই বহন করতে পারে।

কিশোরদের দায়িত্ব

একটা সমাজকে গঠন করতে হলে সে সমাজের সকলকেই এগিয়ে আসতে হয়। এগিয়ে আসতে হয় কিশোরদেরকেও। আজকের কিশোররাই আগামী দিনের জাতির ভবিষ্যৎ। তাই আমরা দেখি হযরত মুহাম্মাদ (সা) যখন মক্কার অন্ধকার সমাজে আলোর মশাল জ্বালাতে অগ্রসর হলেন তখন তার সাথে কচি কিশোর সাহাবীরাও এগিয়ে এলেন। এ সময় হযরত আলী (রা) কিশোর বয়সের। হযরত সবেমাত্র নবুয়ত পেয়েছেন। তিনি তার সমাজের বড় বড় নেতাদেরকে ডাকলেন। সবাইকে বলেন তার সাথী হতে। সকলেই ভয় পেলো। কেননা সত্যের পথে চলতে যে হিম্মতের দরকার তাতো আর সকলের মধ্যে থাকে না। কিন্তু কিশোর বালক হযরত আলী (রা) তখন ঘোষণা করলেন— হতে পারি আমি বয়সে সকলের চেয়ে কনিষ্ঠ আমার গলার আওয়াজ অনেক ক্ষীণ, আমার পা দুটো কচি, এই কঠিন সংগ্রামের পথে চলার যোগ্য নয়, তবুও আমি এই পথ গ্রহণ করলাম। আমি প্রস্তুত এ জন্যে জিহাদ করতে। এমনি বহু সংগ্রামী কিশোর সাহাবী রাসূলের সাথে জিহাদে শরীক হয়েছিলেন। ইসলামের বিজয় ইতিহাসেও অনেক বীর কিশোরের কথা আজো সোনার অক্ষরে লেখা আছে তাই যারা কিশোর তরুণ তাদের এই মহান সংগ্রামের পথে এগিয়ে আসা দরকার। দুঃস্থ মানবতার দুয়ারে সত্যের পয়গাম পৌঁছাতে মানুষকে ন্যায়ের পথে এগিয়ে নিতে, সারা বিশ্বকে ইসলামের আলোকে আলোকিত করতে, মুসলিম কিশোরদেরকেও আজ এগিয়ে আসতে হবে। বিংশ শতাব্দীর সব সমস্যার সুষ্ঠু এবং সুন্দর সমাধান ইসলামের পথে রয়েছে। সে ইসলামকে এই দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব মুসলমানদের। কিন্তু সেই মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা কি তা একবার ভেবে দেখা দরকার। মুসলমানদের নিজেদের দুর্বলতার কারণে তাদের উপর নেমে এসেছিল পরাধীনতার অন্ধকার। বিজয়ী পাশ্চাত্য শক্তিগুলো মুসলমানদের ওপর শুধু শাসন চালায়নি, তারা তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতির মূলে আঘাত হেনেছিল। এই আঘাতে

মুসলমানদের অনেকের মধ্যে বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে দেখা দিলো চিন্তাধারার পরিবর্তন। তারা প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা পেলো না। ইসলাম বা ধর্ম সম্পর্কে যা কিছু শিখলো তা হলো পাশ্চাত্যের শাসকদের শেখানো বুলি। তাদের কাছে ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মত একটা ধর্ম। এ যুগে ইসলাম চলতে পারে না। ইসলাম এ যুগে সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। আসলে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত এবং অসম্পূর্ণ জ্ঞানই এ ধারণার জন্য দায়ী। তাই মুসলিম মিল্লাতকে পুনর্গঠিত করতে হলে দরকার ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার। অনেকে মনে করে ইসলামের সাথে আধুনিকতার কিংবা বিজ্ঞানের মিল নেই। আসলে ইসলাম আধুনিকতার কিংবা বিজ্ঞানের ন্যায় নব আবিষ্কারের বিরোধী নয়। ইসলামের বিরোধ পাশ্চাত্যের মতবাদের সাথে, চিন্তাধারার সাথে। তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে দুনিয়ার মানুষের জন্যে চলার পথ দিতে চায়। আর ইসলাম আল্লাহর দেখানো পথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা এবং তার প্রয়োগের মাধ্যমে মানবতার মুক্তি আনতে চায়। ন্যায়-নীতি বাদ দিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতায় কি লাভ? নিজের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠার জন্যে, মানুষকে মারার জন্যে বুদ্ধি খাটিয়ে 'আনবিক বোমার' মত ধ্বংসাত্মক মরণাস্ত্র তৈরি কি আধুনিকতা? ইসলাম এই হিংসা, ঘৃণা ও স্বার্থপরতা মাখা আধুনিকতা চায় না। সেই সকল সেকেলেপনা এবং পুরাতন কুসংস্কারের পূজারীও নয়। বহুদিনের জড়তার ফলে ইসলামের নামে যে সমস্ত কুসংস্কার চলছে তার অবসান চাই। আর এসব কিছুর জন্যে প্রয়োজন প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার। মুসলিম কিশোরদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। যাতে করে একজন ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার সাথে সাথে তারা মুসলিম ডাক্তার কিংবা মুসলিম ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। তবেই না সমাজ তাদের দ্বারা উপকৃত হবে। মুসলিম যুবকদের উপর আরও একটি বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। পৃথিবীর মানুষ ইসলামকে চায়। তারা চায় ইসলামকে যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে নিতে। আর যেহেতু ইসলাম এখন পৃথিবীর কোথাও প্রতিষ্ঠিত নেই, তাই মানুষ ইসলামকে জানবে বুঝবে যে ভাবে তা পেশ করা হবে সেই ভাবেই। বর্তমান যুগের যাবতীয় সমস্যার ইসলাম কি সমাধান দেয় তা তাদের কাছে পরিষ্কার করতে হবে। পাশ্চাত্য

জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা সংস্কৃতির সুষ্ঠু পর্যালোচনা করে দেখিয়ে দিতে হবে এর দোষ ত্রুটি, সত্য, মিথ্যা, গ্রহণীয় ও বর্জনীয় কি আছে। আর এর জন্যে প্রয়োজন ইসলামী সাহিত্যের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গভীর অধ্যয়ন এবং কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্যের ওপর ব্যাপক গবেষণা। এই বিরাট দায়িত্বের জন্যে এখন থেকে মুসলিম কিশোরদের তৈরি হতে হবে।

জাতির পুনর্গঠনের এ কাজ সহজ নয়। এ সমাজের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা নিজেদেরকে গড়ে তুলতে এবং অন্যদেরকে গড়ার কাজে আগ্রহী। এই সব সত্যপ্রিয় কিশোরদেরকে একত্রে অগ্রসর হতে হবে। এ কাজ তখন সম্ভব যখন ইসলামের আহবান বলিষ্ঠভাবে চারিদিকে প্রচারিত হবে। রাসূলে খোদা (সা) সমাজের লোকদের তিরস্কার, অপবাদ, লাঞ্ছনা উপেক্ষা করে ইসলামের আহ্বানকে তাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। ফলে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলো সে যুগের সত্যপ্রিয় মানুষরা। তেমনি ভাবে ইসলামের বিপ্লবী আহ্বানকে যদি সত্যিকারভাবে সমাজে প্রচার করা হয় তবে এই বিংশ শতাব্দীর ঘুণে ধরা সমাজ থেকেও বেরিয়ে আসবে সত্যের মশাল নিয়ে হযরত আলী (রা)এর মত অনেক তাজা তরুণ প্রাণ হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওসমান (রা)এর মত অনেক দানশীল ব্যক্তি এবং হযরত ওমর (রা)এর মত সিংহদিল পুরুষ। খালেদ, মূসা তারিকের মত মুসলিম তরুণরাও জেগে উঠবে সত্যের মশাল নিয়ে।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) তাঁর সারা জিন্দেগীতে অশেষ কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে নিজের জীবনে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাঁর চলা ফেরা, চাল-চলন, স্বভাব চরিত্র ছিল ইসলামের জীবন্ত প্রতীক। তাঁকে দেখেই মানুষ বুঝলো ইসলামের পথ কত মহান, ইসলাম কত সুন্দর। আসলে এটাই নিয়ম। সাধারণ মানুষ একটা আদর্শকে তখনই গ্রহণ করে যখন সে বাস্তবে দেখতে পায় সে আদর্শের মহত্ব। বিংশ শতাব্দীর মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে যখন মুসলমানেরা তাদের জীবনে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়ে দিবে যে ইসলাম মানুষকে কত উদার করে কত মহৎ করে। ধূসর মরুর কঠোর হৃদয়ের বেদুঈনরা যদি ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হতে

পারে তবে আজকের বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ মানুষ কেন ইসলামের দিকে আসবে না? আমরা যদি আমাদের নিজেদের জীবনে ইসলামী রীতি-নীতি মেনে চলি ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে পারি এক সুন্দর সুখী সমাজ, তবে দলে দলে মানুষ এই মহান মুক্তির পথে এগিয়ে আসবে। তাই মুসলিম তরুণদেরকে আজ নিজেদের জীবনকে ইসলামের রঙে রাঙিয়ে তুলতে হবে। তাদেরকে ইসলামের উজ্জ্বল প্রতীক হতে হবে। তাদের দেখেই মানুষ ইসলামের দিকে আসবে— তাদের কথা শুনে নয়। আর এ জন্যে প্রয়োজন অনেক বেশী করে ইসলামী জ্ঞানের চর্চা, ইসলামী চরিত্র গঠন।

মুসলিম তরুণদের কাছে তাই উদাত্ত আহবান— এসো মানবতার মুক্তির পয়গাম চারিদিকে ছড়িয়ে দেই, এসো গড়ে তুলি সত্যের ঝাণ্ডাবাহী একদল সৈনিক— যারা মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্বকে খতম করে দিয়ে গড়ে তুলবে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এক সুন্দর সমাজ। যেখানে মানবতা পাবে মুক্তি, বিরাজ করবে শান্তি, ন্যায়নীতি, সততা ও ভ্রাতৃত্ব।

এই উদ্দেশ্যে আমাদের চলতে হবে সুশৃংখল ও সুসংগঠিতভাবে। তৈরি করতে হবে নিজেদের মধ্যে সীসাঢালা প্রাচীরের মত মজবুত সম্পর্ক। রাসূলের (সা) দেখানো পথ ধরে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। জেনে নিতে হবে সেই আলোকিত পথের ঠিকানা। ■